Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 313 - 322
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘হৃদয়ে রাইমা’ : হারাধন বৈরাগীর গল্প কিংবা উপন্যাস নয়, এক স্মৃতি আখ্যান গ্রন্থ

অমর্ত্য দাস
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
সরকারী মহাবিদ্যালয় পানিসাগর
পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত
Email ID: amartyadas269@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tripura, Haradhan Bairagi, Nature of Tripura, Beauty of Tripura, Raima-Saima, Hills, Culture, Tribal, Traditional Food, Dhalai District.

Abstract

Tripura is a small state in northeastern India. This state, surrounded by mixed culture, natural beauty and mountains, is home to various ethnic groups. Bengalis live in the plains of the state and hill tribes live in the hills. Although the two nations come from different backgrounds, the hill Bengalis of this state seem to complement each other. The spirit of literary pursuits was quite strong throughout this state of mixed settlement. The history of Bengali language and literary pursuits is long in this state. One such personality in this background of literary pursuits and literary writing is Haradhan Bairagi. He has engaged himself in literary pursuits in various ways. The hills, mountains, nature and tribal society of Tripura have repeatedly touched the writings of Haradhan Bairagi. Nature easily blends into the background of the public life of Tripura. As a result, tribal communities and nature have repeatedly become one in the creations of those who have dedicated themselves to the worship of literature. And with these captivating mountains and natural beauty in the background, one after another, the literary world of Tripura has been written in a beautiful style. One of the writers of this genre is Haradhan Bairagi. In his literary creations, the struggle for life, the struggle for survival, and the food and clothing of the tribal tribes living in the hills of Tripura can be observed to a great extent. As a result, the mountain-loving and jungle-loving writer Haradhan Bairagi has not only given a touch of innovation in his writings, but also has expressed them fluently. He has tried to bring his writings to the highest peak of richness from real life experiences. He has spent most of his life wandering around the hills and forests, and the reality and experience he has gained while wandering around has been tried to express in the form of the book 'Hridoye Raima', (2021) one of his life's literary works. As he wandered around the hills, in the jungle, he has also extracted various problems of the tribal communities, their lifestyle, culture, etc. As a result, all

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

the books are truthful in their events. His language, wordplay, and other skills have become extremely fluent in this work.

Discussion

পাহাড়-পর্বত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা উত্তরপূর্ব ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে শিল্প সাহিত্য চর্চার একটি বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল অনেক কাল আগে থেকেই। আর এই সাহিত্যচর্চার তথা ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে এক অন্যতম নব্য সংযোজিত নাম হল হারাধন বৈরাগী। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলার দিরাই থানার জটি গ্রামে লেখক হারাধন বৈরাগী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল বনমালী দেবনাথ এবং মাতা ছিলেন প্রভাষিনী দেবী। দেশভাগের যন্ত্রণায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি চলে আসেন ভারতের এই ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার উত্তর জেলায়। সেখানে এসেই তার অক্ষরজ্ঞান ও হাতেখড়ি হয়। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগে তিনি বিষয় শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্তি পান। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক হারাধন বৈরাগী পেশায় একজন শিক্ষক হলেও বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্য রচনার সাধনায় তিনি সর্বদা নিজেকে সমর্পণ করে রেখেছেন। শিক্ষকতার কাজের সাথে সাথে তিনি রচনা করেছেন বহু কাব্যগ্রন্থ। তবে হারাধন বৈরাগী শুধুমাত্র কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নিজেকে আটকে রাখেননি কবিতা রচনার পাশাপাশি রচনা করেছেন বহু গল্প, সমালোচনা গ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস। তার রচনায় উঠে এসেছে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাস করা উপজাতি অংশের জনজাতিদের দৈনন্দিন জীবন। জঙ্গল, পাহাড় এবং উপজাতি অংশের মানুষের প্রতি তার যে টান, যে অনুরাগ তা-ই উঠে এসেছে তার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে। আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধনটিতে লেখক হারাধন বৈরাগীর স্মৃতি আখ্যানমূলক গ্রন্থ ‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১) সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি লেখক হারাধন বৈরাগী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে এক গবেষণাধর্মী আলচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

জন্মসূত্রে লেখক হারাধন বৈরাগী বর্তমান বাংলাদেশের হলেও বিভিন্ন কারণ যেমন দেশভাগ, উদবাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে প্রথমে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের লালজুরী রিজার্ভ ফরেস্টে বসবাস করলেও পরবর্তী সময়ে চলে আসেন কাঞ্চনপুর শহরের দ্বিতীয় বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে। কর্মসূত্রে হারাধন বৈরাগী ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রিপুরার নানা স্থানে। ঘুরে বেড়িয়েছেন জঙ্গলে জঙ্গলে। জঙ্গলের প্রতি লেখক এর টান ছিল অন্যরকম। এই জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই লেখক হারাধন বৈরাগী লিখেছেন তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ ও গল্পগ্রন্থ। তার সমস্ত কবিতা, গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় জঙ্গল ও পাহাড়ি জনজাতিদের গন্ধ। তারই রচিত এক অন্যতম রচনা সমগ্র হল ‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১)। এই গ্রন্থের নামকরণ স্বয়ং লেখক করলেও এটি কি জাতীয় রচনা সেটির দায়িত্ব দিয়েছেন পাঠক সমাজকে। গ্রন্থটির গৌরচন্দ্রিকায় লেখক লিখেছেন—

> “ ‘হৃদয়ে রাইমা’কে উপন্যাস, গদ্য বা স্মৃতিআখ্যান কি বলা যাবে জানিনা। এ নির্বাচনের দায়িত্ব পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। সময়কে জানি ভাগ করা যায় না। তবু সময়ের সাথে সাথে তো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। কারো কারো মনে অসম্ভব দাগ কাটে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সেই দাগ থেকে কিছু লেখা হয়ে যায়।”[১]

‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১) গ্রন্থটিকে অনেকেই আত্ম উপন্যাস বলেই মনে করেছেন। গ্রন্থটিতে লেখক হারাধন বৈরাগী তার জীবনের একটি বিশেষ সময়কালকে অত্যন্ত নিপুন দক্ষতার সাথে শব্দ চয়নে নিবন্ধন করেছেন। গ্রন্থটিকে তিনি ঊনআশিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে তিনি তার জীবনের সেই বিশেষ একটি সময়কালের নানা অভিজ্ঞতা, তার সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনী সমূহকেই তুলে ধরেছেন। তিনি যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তাকেই গ্রন্থের কাঠামোয় রূপ দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবন যাপনের নানা চিত্র। তাদের সামাজিক অবস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

লেখক ছিলেন পেশায় একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার চাকরির সুবাদে তিনি প্রথমে লালজুরী স্কুলে চাকরি করেন কিছুদিন। পরবর্তী সময়ে লালজুরী থেকে তার বদলি হয় ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার জগবন্ধু পাড়ায়। জগবন্ধুপাড়ায় বদলির খবর কানে আসতেই একদিকে তিনি যেমন কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন কেননা তিনি জানতেন—

> "গন্ডাছড়া ত্রিপুরার ধলাই জেলার সর্বাপেক্ষা প্রত্যন্ত মহাকুমা। সর্বাঙ্গে তার কুহকময় জঙ্গলের ঘ্রাণ। মোঙ্গলীয় জনজাতিদের আদিম বাসস্থল। রাইমা সাইমার ভালোবাসার কুঞ্জবন। অনির্বাচনীয় বুনোগন্ধ যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আমার কর্মস্থল হবে, ভাবলেই মনটা চনমনিয়ে উঠত।"[২]

জঙ্গলের প্রতি নিশিটান লেখকের কাছে নতুন নয়। লেখক আজীবন দেওভ্যালির পাহাড় জঙ্গল একাকার করেছেন। রাতের অন্ধকারে লেখক যৌবন বয়সে বন্ধুর সাথে রাতের আঁধারে জঙ্গলের টানে বেরিয়ে পড়তেন, খুঁজতেন ভূত-প্রেত। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতেন, প্রায়দিন রাত কাটাতেন আদিবাসীদের ঘরে। আদিবাসীদের কাছ থেকে শুনতেন জঙ্গলের কুহকময় জীবন কথা।

লালজুরী স্কুল থেকে জগবন্ধুপাড়ার স্কুলে যোগদানের দিন কাঞ্চনপুর থেকে গন্ডাছড়া যাওয়ার যাত্রাপথের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গ্রন্থের মধ্যে। কাঞ্চনপুর থেকে মনু মাত্র ২৫ কিমি যাত্রা করে লেখক পৌঁছে যান এক জনশূন্য রাস্তায়। এ রাস্তার সবথেকে জনবিরল স্থানে গড়ে উঠেছে মিজোরাম থেকে আসা শরণার্থীদের গ্রাম। সেই গ্রামে ঢুকতেই লেখক জানতে পারেন অতীত ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তি কয়েকের বাসস্থান ছিল এই গ্রামেই—

> "পথে পড়ে অসংখ্য চড়াই উৎরাই গিরিখাত আর অনেকগুলি পুল। এই পথেই ত্রিপুরার খ্যাতনামা কথাকার শ্যামাচরণ ত্রিপুরার জন্মস্থান ঈশাণ রোয়াজাপাড়া, ১৯৪২ এর রিয়াং বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মাংছল রিয়াং ও হান্দাইসিং রিয়াঙের অগস্ত্য বাসস্থল।"[৩]

তৎকালীন ত্রিপুরায় উগ্রবাদীদের উপদ্রব ছিল ব্যাপক। প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো স্থানে কেউ না কেউ উগ্রবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত কিংবা নিখোঁজ হয়েছে সেই খবর পাওয়া যেত। লেখক হারাধন বৈরাগীও তার শিকার হয়েছিলেন। পেঁচারতল থেকে একটি মালবোঝাই ট্রাকে করে গন্ডাছড়ার পথে যাওয়ার সময় লংতরাই পাহাড়ে এসে গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। লেখক গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় যখন হাঁটাহাঁটি করছেন তখন হঠাৎ শুনতে পান কয়েকজন লোকের কথা। তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে ওরা আদিবাসীদের ভাষায় বলংবরক (উগ্রবাদী)। প্রাণ রক্ষার জন্য লেখক ছুটে চলেন পাহাড়ের উপরে থাকা একটি জুম ঘরের দিকে। সেই জুম ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি এবং তার মেয়ে। তিনি তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তারা বলেন—

> "উদ্দিষ্ট মামা আমাকে চটজলদি হাতে ধরে গাইরিঙে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল- ভাগিনা, তুই বাছবো। কোন চিন্তা করবো না। তরে কি বলংবরক ধরেছিলো রে, তুই ভাগছসনি ভাগিনা? বলংবরক দেখলে আমারেও তর সাথে কাটবো"[৪]

সেই রাতটি তিনি সেখানে কাটান। পরদিন সকালে সেই যুবতী তাকে পথ দেখিয়ে দেয় জাতীয় সড়কের। তিনি আবার গাড়ি ধরে শুরু করেন যাত্রা আর পৌঁছে যান জগবন্ধুপাড়ায়। জগবন্ধুপাড়ায় আসার আগে লেখকের এক প্রতিবেশী শিক্ষক তাকে বলেছিল তার এক আত্মীয় জগবন্ধু পাড়ায় থাকে। তিনি যেন এখানে এসে তার সাথে দেখা করেন। তিনি তাকে একটা ভাড়া ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। সেই মত জগবন্ধু পাড়ায় আসার পর লেখক তথা শিক্ষক তার কলিগ হারানকে সত্যেন পালের কথা বলতেই সে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। সত্যেন পালের ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান। তিনি তাদেরই অপেক্ষা করছিলেন। দোকানের পাশে যেতেই তিনি হাত নাড়িয়ে তাদের ডাকতে লাগলেন। কিন্তু লেখক তার স্ত্রীর বারন থাকায় সত্যেন পালের বাড়িতে ঘর ভাড়া রাখেননি। কারণ—

> "ভোরবেলা মন কিছুটা ভালো হলে বলেছিলেন, সাক্ষীদের বাড়িতে ঘর ভাড়া করা যাবে না। ওর বরের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, বাবার কাছে আছে। দেখলে না কেমন বেপরোয়া মেয়ে। এমন মেয়েদের আমার বিশ্বাস নেই। আসতে না আসতেই তোমাকে আপন জামাই বাবু বানিয়ে ফেললো, কী না আমার বোনেরে। পরে কিনা..."[৫]

অবশেষে ঘর ভাড়া রাখেন গন্ডাছড়ার সুবোধ বিশ্বাসের বাড়ি। সেই বাড়িতেই লেখকের নতুন কলিগ দীপঙ্কর চক্রবর্তী ভাড়া থাকতো। সেখানে মাস খানেক থেকে পরে চলে আসেন জগবন্ধুপাড়ায়। কেননা গণ্ডাছড়া থেকে জগবন্ধু পাড়ার দূরত্ব খুব বেশি না হলেও গাড়ি ভাড়া অনেক বেশি। জনজাতি অধ্যুষিত সেই গ্রামে ঘর ভাড়া রেখে তিনি চলে আসেন। মনে মনে ভয় থাকলেও তিনি সাহসের জোগান করেছেন। কেননা ভয় থাকলেও তাকে সেখানে থাকতে হবে।

জগবন্ধু পাড়ার সেই গ্রামে এসে লেখক প্রথম মৌরলা মাছের চচ্চড়ির প্রেমে পড়েছেন। এখানে আসার পর মরশুমে লেখকের খাদ্য তালিকায় রোজ মৌরালা মাছ ছিল। লেখক শিখেছেন সেই রান্না। আবার আদিবাসীদের অতি প্রিয় খাদ্য বাঁশকুড়ুল যা বর্তমানে সমতল বাসীদেরও অত্যন্ত প্রিয় একটি খাদ্য। লেখকের স্ত্রী বাঁশকুড়ুল একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু লেখকের ছেলেবেলা থেকেই বাঁশকুড়ুলের সাথে অত্যন্ত মাখামাখি। তিনি বলছেন—

> "গোদকের সাথে আমার ছেলেবেলা থেকেই মাখামাখি, যেমন ছোটবেলা থেকেই আমার মাখামাখি জনজাতি মানুষের সাথে। বড় হয়েছি জাতি উপজাতি মিশ্র পরিবেশে। জনজাতি বন্ধুদের সাথে নাওয়া-খাওয়া করতে গিয়ে গোদকের প্রেমে পড়েছি।"[৬]

ষোল নং পরিচ্ছেদে এসে লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরার এক বিখ্যাত কবি আপাংশু দেবনাথ এর কথা। লেখককে এক মুখবইবন্ধু দূরভাষে বলেছেন—

> "আপনি কি আগামীকাল জগবন্ধু থাকছেন হারাধন দা? আমি আপাংশু দেবনাথ, আগামীকাল আপনার কাছে আসতে চাইছি।"[৭]

আপাংশু দেবনাথ লেখকের সাথে দেখা করবেন সে কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। লেখক মনে করেন এমন কবির দর্শন যেন তার সাত জন্মের পূণ্য ফল। কবির হঠাৎ মনে পড়ে গেল ত্রিপুরার আরেক কবিতা পুরুষ সেলিম মুস্তাফার একটি কবিতার কথা। তিনি সেই কবিতার লাইন তুলে ধরেছেন তার একটি পরিচ্ছেদের মধ্যে —

> "কবিরা স্বর্গের পাখি, এরা যতদূর যায় স্বর্গ ততদূর ছড়িয়ে পড়ে –। আপাংশুদের মত কবি দর্শন তো আমার কাছে স্বর্গ দর্শনের মতো।"[৮]

আপাংশু দেবনাথের সঙ্গে যিনি এসেছেন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে তাকে লেখক যেন চিনেও চিনতে পারছেন না। হঠাৎ মগজে জুড়ে চাপ দিতেই লেখকের মনে পড়ে উনি তো কবি গোবিন্দ ধর। যার সাথে প্রায় বছর পাঁচেক আগে লেখকের দেখা হয়েছিল বর্তমান উনকোটি জেলার অন্যতম শহর কুমারঘাটে, এরপর আর দেখা হয়নি তার সাথে। গোবিন্দ ধর হলেন ত্রিপুরার এক সাহিত্য প্রকাশনা স্রোতের কর্ণধার। লেখক নিজেকে আউলা বৈরাগী বলে আখ্যায়িত করছেন। আবার জগবন্ধু পাড়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্বীকার করছেন —

> "আমি সাধারণ এক আউলা বৈরাগী, শুধু বাঁশ খেতে খেতে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরছি। মনে মনে বললাম, —জয় জগবন্ধু, আজ আমাতে তোমাতে, তোমাতে তোমাতে দেখা. জানিনা তোমার যে আর কত লীলা প্রভু।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক, লেখকের গিন্নি এবং দুই কবির সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেল হলে দুই কবিকে নিয়ে লেখক ঈশ্বরাই পাড়া হয়ে ডুম্বুরের পথে পথে ঘুরে আসেন। লেখক এর গিন্নির আবদার ছিল ডুম্বুরের চিংড়ি মাছ। লেখকের গিন্নির বাঁশকুড়ুল চোখের বালি হলেও ইদানিং তিনিও বাঁশকুড়ুল প্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন। তিনি বলেন —

"গিন্নি বললেন – রাতের খাদ্য তালিকায় চিংড়ি বাঁশকুড়ুল চচ্চড়ি আর চিংড়ি বড়া।"[১০]

এখানে লেখক হারাধন বৈরাগী অত্যন্ত নিপুন দক্ষতার সাথে ত্রিপুরার পার্বত্য জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রিয় খাদ্য তালিকার বর্ণনা যেমন করেছেন তেমনি পাহাড়ি জনজাতি অংশের মানুষের সঙ্গে সমতলে বসবাসকারী মানুষের এক অপার সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন যেন। তার লেখনী সত্তায় বারাবরই জাগ্রত হয়েছে জাতি উপজাতির মেলবন্ধন।

আপাংশু দেবনাথ এবং গোবিন্দ ধরের মতো সুনামধন্য কবিরা কবি হারাধন বৈরাগীর মুখে কবিতা শুনতে চান। এখানেও তিনি অনেক পুণ্যের কথা বলেন। তিনি ভাবছেন তার মতো অধমের মুখ থেকে এমন দু'জন মানুষ কবিতা শুনতে চায়, সেটা তার ভাগ্যের ব্যাপার। শুরু হয় কবিতা পাঠ। কবি আপাংশু দেবনাথ বললেন—

> "জুমপোড়া ছাই শরীর থেকে ধুবো বলে সাইমার মায়াতরলে ছড়িয়ে দিয়েছি গা। পেরিয়ে আসা জিগজাগ পথের ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। আর সঞ্জয় নয়নে স্পষ্ট দেখতে পেলাম কোভিদ হাসমত সৌররঙ মেখে কৌতুহলী হরিণীর মতো সাঁকো পেরিয়ে ধীরে নেমে আসছে জলে। শিকারি বকের মতো পা ফেলে আমার গা ঘেঁষে উজানমুখী হল। তাকিয়ে থাকি নির্ণীমেষ। হৃদয়ের পাশে থাকা ফকিরকেও বলতে পারিনি কিছু। কিছুদূর এগিয়ে সাইবার জলে শরীর ভিজিয়ে, জল মাটির পাড়ে হাত গলিয়ে কি যেন তুলে রিয়ার কোচড়ে ভরছে হাসিমতি।"[১১]

জটলবাঁধা টংঘরের সমাহারে গড়ে ওঠা ঈশ্বরাইপাড়া। ত্রিপুরা হল জনজাতিদের গা। বিকালের রুশোণায় টংঘরগুলি মায়ার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন পড়ে। কবি আপাংশুর চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। তিনি ধরিত্রীর প্রথম শব্দের মত গমগমিয়ে বলতে লাগলেন —

> "হয়তো কোন এক অদ্ভুৎ ত্বরণ, আমাদের বোধের রন্ধ্রপথ ধরে ঘুরেফিরে শূন্য বিন্দুতে এসে মেশে। আর আপনি ও আমাতে তখন কোন তফাৎ থাকে না। সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে মেঘ নদী হয়ে নামে আকাশ থেকে। ত্বরণ বিন্দু মিশে আলো হয়ে জ্বলে। বৃষ্টি তুই আকাশেই থাকিস মেঘের বুকে। আমি জরুরী জঙ্গলে এসেছি হারানো সুখে।"[১২]

এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যায় লেখক হারাধন বৈরাগী কতটুকু প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন। তিনি লেখনিতে যে তত্ত্ব কিংবা ভাষাগুলোর প্রয়োগ করেছেন তাতে প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য যেমন ফুটে ওঠে তেমনি লেখকের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনারও এ যেন এক নিপুন আত্মপ্রকাশ। তিনি ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে বিষয়গুলোকে তার লেখায় উঠিয়ে এনেছেন তাতে পাহাড়ি রাজ্য এই ত্রিপুরার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যতাই উঠে আসে বারংবার। লেখক তার হারানো সুখের প্রত্যাশায় কিংবা তার হারানো সুখকে খোঁজে পেতেই যেন তার এই জঙ্গল ভ্রমণ।

লেখক বিমুর্ত কবিদের ছবি বন্দি করতে লাগলেন আপ্লুত আবেশে। কবি গোবিন্দ ধর বললেন —

> "হাসমতি তুমি তো সকল কবির মানসকন্যা। তোমার চোখের ট্যারা ইশারা থেকেই কি ঈশ্বরাইর জন্ম কাহিনী। অসংখ্য টিলার খাজ আর হাসমতির বুকের মতো টিলাগুলোর রহস্য মায়া বিকেল ডিঙিয়েই কী আমরা হাতকুটা জুমের চালের ঘ্রাণ শরীরে মেখে সাইমা_নাকি হাসমতির জলেই স্নিগ্ধ হয়েছি।"[১৩]

হারাধন বৈরাগী দেখতে পান কবি যুগল উদ্দাম প্রকৃতির বুকে বরকিনীর রসাম ও রমোর ধান কুটার মাঝে মিলেমিশে একাকার। ঈশ্বরাই পাড়া থেকে ফেরার পথে কবি আপাংশু লেখককে এক রহস্যময় বৃক্ষের ছবি তুলে উপহার

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেন। অবশেষে পাহাড়ের ঢালে ঢালে জুমঘরের উদ্দাম হাতছানি উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে চলেন গন্ডাছড়া হয়ে ডুম্বুরের পিচ্ছিল ঘাটের পথ ধরে। পথের ধারে এক রহস্যময় বটগাছ তার ঠেশমূল প্রায় অর্ধকানি জায়গা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। লেখক এর মতে এমন বট বৃক্ষ ত্রিপুরায় আর দ্বিতীয় আছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং লেখক এর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ত্রিপুরায় অবস্থিত সবথেকে বড় বটবৃক্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং তার সন্ধান লেখক হারাধন বৈরাগীর কথায় উঠে এসেছে।

বটগাছ পেরোতেই হঠাৎ নেমে আসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। পথের দুপাশে ছিল জেলেদের আস্তানা। কবিদের নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েন জেলেদের ঘরে।

উনিশ পরিচ্ছদের শুরুতেই দেখা যায় তাদের কবিতার আড্ডা বেশ জমে ওঠে। লেখকের মুখে কবিতা পাঠ শুনে কবি গোবিন্দ ধর বলেন—

> "আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম হোক — হাসমতি ত্রিপুরা "[১৪]

কবি গোবিন্দ ধরের এই উক্তিটির মধ্যে থেকে জানা যায় লেখক হারাধন বৈরাগীর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'র নামকরণ করেছিলেন ত্রিপুরার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবি গোবিন্দ ধর। তবে গোবিন্দ ধরের মুখে এই কথাটি শুনে লেখক হারাধন বৈরাগীর মনে সাহিত্য সৃষ্টির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আগুন জ্বলে ওঠে তা থেকেই তার এই অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির গতিপথ যে নির্ধারিত হয়েছিল তা অনায়াসেই বলা যায়। কবি মনে মনে গোবিন্দ ধরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন — 'তাই হোক'। চলতে থাকে কবিতার মাধ্যমে নানান বার্তালাপ।

ঘরে ফিরে আসার পর আপাংশু দেবনাথ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– 'মৃত্তিকাঋন মেঘমিতাকে' – এর একটি কপি লেখক হারাধন বৈরাগীকে দিয়ে বললেন এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করে এটির জন্য একটি আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে হারাধন বৈরাগী জানতে পেরে গিয়েছেন যে —

> "জানলাম এটি আলোচনা করেছেন বাংলাদেশ ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঘা বাঘা কবিজন, কবি সন্মাত্রানন্দ কৃষ্ণার্পিত, কবি পীযূষ বিশ্বাস, কবি সঞ্জিত বণিক, ইসরাত আফতাব অনন্যা, কবি রীতা শিব, কবি বিদিশা সরকার। ভূমিকা লিখেছেন এ রাজ্যের অন্যতম কবি ও লোক গবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন।"[১৫]

আপাংশু বলেন এই কাব্যগ্রন্থটি মাত্র তার পঞ্চাশ মিনিটের লেখা একটি পত্র কাব্য। তখন হারাধন বৈরাগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে এই কাব্যের আলোচনা কি তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে। মনে মনে তিনি জগবন্ধুকে ডাকতে লাগলেন। বলে উঠেন 'জগবন্ধু আমাকে এবারের মত রক্ষা করো প্রভু!'

তেইশ পরিচ্ছেদে লেখক ত্রিপুরার বর্তমানে বহু প্রচলিত কিংবা সকলের মুখে মুখে যে বিষয় উঠে এসেছে সেটি হলো ১০ হাজার ৩২৩, এই ১০ হাজার ৩২৩ বিষয়টির বিষয় নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষেরই জানা যে আদালতের নির্দেশানুসারে ১০ হাজার ৩২৩ জনের শিক্ষকতার চাকরিতে অবসান ঘটে। এরপর উচ্চ আদালতের রায়কে আপত্তি জানিয়ে রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ ন্যায় আদালতও উচ্চ আদালতের রায়কে বহাল রাখে এবং বলে ১০ হাজার ৩২৩ এর চাকরি ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। লেখক এই বিষয় সম্পর্কে বলছেন —

> "এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাজার সর্বদা সরগরম থাকতো। হাটে মাঠে-ঘাটে এই নিয়ে আলোচনা মুখরোচকে পরিণত হল। ফলে ১০৩২৩ কিছুদিনের মধ্যেই যেন শিক্ষাবিভাগের অঘোষিত দূতে পরিণত হল। আর সারা রাজ্যে ভিলেন হয়ে গেল মামলাকারীরা। এই সুবাদে কেশরিও জগবন্ধুতে।"[১৬]

জগবন্ধু পাড়ায় এসে লেখক ভাবছেন তিনি সেখানে এসে যে পাগলের পাল্লায় পড়বেন সে কথা ভাবতে পারেননি। পাগল দেখলেই লেখক এর স্নায়ু শক্ত হয়ে যায়। যেমন গাড়ির চালক দেখলে। চলার পথে যদি কোন চালক বড় রকমের কোন ক্ষতি করে দেয় তাকে তিনি কিছু বললেন না মুখ ফুটে। সহসাই তিনি পাগল দেখলে আগে থেকেই সমঝে চলেন। আর যদি বিপদে পড়ে যান তখন বোলতা আক্রমণের মুখে পড়ার মতো মূর্তি হয়ে থাকেন।

স্কুলবেলা লেখক ধর্মনগর বি.বি.আই - তে পড়ার সময় একদিন উপাহার কালে অফিসটিলা থেকে একটি দ্বিচক্রযানে চড়ে স্কুলে ফিরছেন তখন এক পাগল তার সামনের দিকে সেন্ট্রাল রোড ধরে হাত উড়িয়ে খিস্তি দিতে দিতে আসছিল। তখন কাছে এসেই লেখকের গালে সজোরে এক থাপ্পড় কষিয়েছিল। লেখক তখন অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কানে যেন তার তালা লেগে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি পাগল দেখলেই ভয় কেঁপে ওঠেন। আর গাড়ির চালককে তিনি কেন ভয় করেন সেই বৃত্তান্তও তিনি দিয়েছেন —

> "আর গাড়ির চালক। কিশোর বেলা তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াইর পথে এক সপ্তাহ একটি ট্যাক্সি গাড়িতে সহকারীর কাজ করেছিলাম। সওয়ারি বেশি হলে চালক আমাকে গাড়ির লটবহর বাক্সে ঢুকিয়ে দিত। আর আমিও পোটলার মত চলে যেতাম খোয়াই শহরের কাছাকাছি। চালক তখন আমাকে আসবাব বাক্স থেকে বের করে যাত্রীর সাথে চেপে বসাতো। একদিন মোটর স্ট্যান্ডের মুখে যেতে যেতে হঠাৎ আমার পাশের দরজাটা খুলে যায়। আর গাড়ি থামিয়ে চালক আমাকে এমন এক থাপ্পর দিল, পেচ্ছাপ ছুটে গিয়েছিল। অন্ধকার দেখলাম।"[১৭]

কাপড়ের ঘোর কেটে গেলে লেখক দেখেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন খোয়াই দ্বাদশ স্কুলের সামনে। আর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখককে অবাক চোখে দেখছে। এর থেকেই হারাধন বৈরাগী পাগল আর গাড়ির চালক এই দুইটিই তিনি অত্যন্ত ভয় করেন।

পরিচ্ছেদ সংখ্যা সাতাশে দেখা যায় লেখক জঙ্গলের প্রতি যে তার নিবিড় টান সেই কথাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জঙ্গলের সঙ্গে লেখক এর যে আত্মিক সম্পর্ক সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

> "জঙ্গলের সাথে আমার আজন্ম সখ্য। জঙ্গল দেখলেই এক কুহকময়ী নারী মনে হয়। সে প্রতিদিন আমার সম্মুখে রূপ পাল্টায়। আমার সাথে পরকীয়া করে। প্রেমিকার মতো মান অভিমান করে। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমার ঘোর লেগে যায়।"[১৮]

জঙ্গল, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি প্রবৃতের প্রতি ছিল লেখক এর অত্যন্ত টান। কিন্তু আজ বন-দস্যুদের তাণ্ডবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গল, আর এই ধ্বংসের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বনের নানা রকম পশু পাখিরাও। লেখকের তাতে ভীষণ আক্ষেপ। তিনি বলেছেন শৈশবে তিনি যে দেওভ্যালির জঙ্গল দেখেছেন তা যেন ছিল একটি প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানা। হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, সজারু, শুকর, বনরুই, হরিণ, সাপ, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি বিচিত্র প্রজাতির পশু পাখি, উদ্ভিদ লতা গুল্ম নিয়ে অসম্ভব রকম জীবন্ত ছিল এই বনতট। তখন মানুষ মানুষের কাছে আশ্রয় চাইতো। কিন্তু আজ এই উদোম পাহাড় দেখলে জঙ্গলের প্রাণীদের কথা ভেবে লেখক অসম্ভবভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি মানুষের অধিকারের পাশাপাশি প্রাণীদের অধিকারকে অস্বীকার করতে পারেন না। মানুষের সাথে আজ পশুদের লড়াইয়ে তারা অসম্ভব পেছনে চলে যাচ্ছে। এ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি যেন যন্ত্রনা অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন —

> "এই অধিকারের লড়াইয়ে মানুষগুলো যেন এক এক জন স্বপর্যক্ষ যার মৃত্যুর পর নাগাটুয়ারিতে আবিষ্কৃত হয়েছে অজস্র মণি মানিক্য বা বিজ্ঞান নামক অমূল্য রত্ন যার অব্যবহার – অপব্যবহারের ফলে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। সে বুদ্ধিতে প্রাণীকুলের শিরোমণি। তবু সে সবচেয়ে বোকা কালিদাস সেন। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে।"[১৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক হারাধন বৈরাগী মনে করেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আজ অহংকারে মাটিতে পা ফেলতে পারছে না। তারা কেবল কিছু গৃহপালিত পশু নিয়ে ছটফট করছে আর ঢলে পড়ছে বন্ধ্যা মাটির বুকে। তাই লেখক মনে করেন এর জন্যই হয়তো অম্ল জানের হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, বাতাস বাড়ি হয়ে উঠেছে আর অসহায় হয়ে পড়েছে লেখক এর আত্মজ অর্থাৎ বন্য জঙ্গল, বনের পশু পাখিরা।

মানুষকে লেখক স্বার্থপরতার নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে যত প্রাণী আসে তারা সকলে তাদের নিজ নিজ বুমেরাং সাথে নিয়ে আসে কিন্তু মানুষ যাদের এত বড় একটা মস্তিষ্ক আছে এবং মানুষ নাম যাদের একটাই প্রজাতি, যাদের মগজ একটা এবং তা সম্পূর্ণ তার একার, আর কোন প্রাণীতে তা বন্টিত নেই যা এই প্রকৃতির একটি বিরলতম ব্যতিক্রম।

লেখকের চোখের সামনে ভেসে উঠে এক বান্ধ্যা পৃথিবী। যার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে, তার কোন মূল্য নেই। লেখক মনে করেন পৃথিবীটা আজ এমন হয়েছে যে দেখলে মনে হয় যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে শুধু আবর্জনা ওঠে কেন।

> “যেখানে মানুষ নেই। চারপাশে শুধু আবর্জনা – ক্যান। ফাঁকে ফাঁকে কিছু ওয়াটার বিয়ার আর অর্কিড। এইসব ভাবতে ভাবতে আমার নাভীশ্বাস ওঠে, শ্বাস উঠে লংতরাইর বিড়িপাতা ছড়াটির মতো।”[২০]

লেখক হারাধন বৈরাগী বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি অর্থাৎ তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সমগ্র পশুকুল নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। আর একজন প্রকৃতিপ্রেমী লেখক এর এই চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় এই যে ত্রিপুরা রাজ্য নামটি মুখে আসলেই প্রথমে তার অরণ্য বেষ্টিত জঙ্গল পাহাড় পর্বত আঁকাবাঁকা পথের চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বর্তমান ত্রিপুরার সামগ্রিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ত্রিপুরার বন জঙ্গল বনদস্যুদের আক্রমণের শিকার প্রতিনিয়ত। আর হারাধন বৈরাগীর মতো একজন প্রীতি প্রেমিক জঙ্গল প্রেমিক কথাকারের প্রকৃতির এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা দেখে আহত হাওয়াই স্বাভাবিক।

বত্রিশ নং পরিচ্ছেদে লেখক হারাধন বৈরাগী পাহাড়ি জনজাতিদের সমাজ ব্যবস্থা নৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। পাহাড়ি জনজাতিরা আদিকাল থেকেই একটু সহজ সরল। তারা জীবন কাটায় পাহাড়ের জুমঘরে, খাদ্য সংগ্রহ করে জঙ্গল থেকেই। কিন্তু তাদেরও চাওয়া-পাওয়ার হিসাব থাকে। কিন্তু শহরের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাদের ফারাক তাকে দিনরাত। তারা শিক্ষার দিক থেকে বঞ্চিত, বিদ্যুৎ নেই, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি উঠে আসে তাদের ঘরে, কিন্তু পরিস্থিতির বদল হয় না। সারা রাজ্যের সাথে পাহাড়েও যখন ভোটের বাজনা বাজে তখন আদিবাসীদের মনের মধ্যে বইতে থাকে আশার চোরা স্রোত। তবে তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা ঘরে তুলে সেই ভোটের ফসল। সাময়িক হলেও সে কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পায়। আর তারাই জুমিয়া জীবন অর্থাৎ পাহাড়ি জীবন ত্যাগ করে ছোট ছোট বাজারে বসবাস করতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পাল্লায় পড়ে এরাই পরিণত হয় দালালে। তারা তাদের স্বজাতি যুবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাদন বিলিয়ে তাদের আওতায় নিয়ে আসে। ভোটের দাদন হিসেবে ভোটের দিন শুকর, মোরগ, চুয়াক অর্থাৎ এক ধরনের দেশীয় নেশা জাতীয় পানীয় তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। যে যাতে খুশি হত তাকে তাই দেওয়া হত।

রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মধ্যে থেকেই তৈরি করে নেতা। নির্বাচনে জয়ী হলে শিক্ষিত ব্যক্তিকে করা হয় চেয়ারম্যান। এই কৃতজ্ঞতা থেকে নিজেদের বিবেক ও দালালদের স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়। দাদন বিলি করেও যদি বিরোধীদের হাতে আনতে অক্ষম হয় তাহলে ভোটের আগের দিন রাতে স্পর্শকাতর পাড়ায় শূকর আর চুয়াকের মহাভোজনের আয়োজন করা হয়। যত বিরোধীই হোক না কেন সেই আমন্ত্রণ কেউ উপেক্ষা করতে পারত না। পুরো রাত চলতে থাকে তাদের মহাভোজ। পরের দিন তারা ঘুম থেকে উঠে আর বুথ কেন্দ্রে যেতে পারে না। আর তাতেই ফায়দা তুলে নেয় তাদের মধ্যে থাকা সেই সুবিধাভোগীরা।

কথাকার হারাধন বৈরাগী তার লেখনীতে সামাজিক সেইসব মানুষগুলোকে নিয়েই আলোচনা করেছেন যারা জন্মসূত্রে সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্বীকার। যাদের সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের সুবিধাভোগী

মানুষেরা নিত্যদিন ফায়দা তুলতে ব্যস্ত থাকে। পাহাড়ি আদিবাসীরা শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠ অন্ন আর মাথার উপরের ছাদটুকুর জন্য লড়াই করে আজীবন নিজেদের সাথেই, আর সুবিধাভোগীরা তাদের আশার বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত থাকে।

লেখক হারাধন বৈরাগী বলছেন এই সুবিধাভোগীদের নিয়েই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মানদন্ড বিচার করা হয়। এরা যুবক হয়েও যুবকদের হর্তা কর্তা বিধাতায় পরিণত হয়। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শহরে রেখে পড়াশোনা করাতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে গাড়ি বানায়, বাড়ি বানায়, রাবার বাগানের মালিক হয়ে শহর মুখী হয়ে ওঠে। আর একটা বৃহৎ অংশের মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য আগের সেই জুম চাষ প্রথাকেই আঁকড়ে ধরেন। লেখক সম্মান করেন সেই অবহেলিত, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত জুম চাষীদের। তিনি মনে করেন এরাই জঙ্গলের পাহাড়ের পর্বতের প্রাণ। এরাই টিকিয়ে রাখবে লেখকের প্রাণের জঙ্গলকে।

জুমে ফসল ফলে বিচিত্র রকমের। যেমন – ধান, তিল, কার্পাস, মরিচ, কাকলু, খামতা, মামরা, চিনার, চাকুমারা, মাইক্রো, মকই, ধনেপাতা। এই ফসলগুলি তুলেই জুমিয়ারা তাদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। তাদের জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের প্রধান রসদই হল জুম চাষ। লেখক আলোচ্য পরিচ্ছেদে বলতে চেয়েছেন যে এই রাজনীতির কারণে আদিবাসীরা আজীবন যেমন বঞ্চিত হয়ে আসছেন আজও তার তেমন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তারা যেখানে জুম বা জঙ্গলেই টিকে থাকার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে এর জন্যই হয়তো তার অতি প্রাণের স্থান বন জঙ্গল আজও কিছুটা টিকে আছে।

লেখক হারাধন বৈরাগীর রচিত ‘হৃদয়ে রাইমা’ গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান জুড়ে এভাবেই রয়েছে পাহাড়ের গন্ধ, মাটির গন্ধ, আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের নানান বিচিত্র কাহিনী। তিনি তাদের দেখেছেন একেবারে সামনে থেকে, রাত কাটিয়েছেন তাদের ঘরে, আহরণ করেছেন তাদের অতীত ইতিহাস, অতীতে ঘটে যাওয়া নানান কাহিনী, তাদের খাদ্যাভ্যাসের তালিকা, তাদের বেশভূষা, তাদের অলংকার প্রভৃতিকে তিনি তার এই গ্রন্থের আঙিনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

একটি নির্দিষ্ট যাপন কালকে অবলম্বন করে হারাধন বৈরাগী আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে লেখকের ব্যক্তি জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা কাহিনী আর আদিবাসী জীবন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পাহাড়ে বসবাস করা জনজাতি আদিবাসীদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রখর। তিনি তার জীবনের প্রায় বেশিরভাগ সময়টাকেই কাটিয়েছেন সেই জনজাতিদের সঙ্গে। তাদের খাবারের প্রতিও লেখকের লোভ ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি পেশায় শিক্ষক হলেও সাহিত্য সাধনা তাকে পৌঁছে দিয়েছে এক অন্য মাত্রায়। ফলে তার সমগ্র লেখনী জুড়ে দেখা যায় এক অন্যতম সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট। শহুরে বাতাস লেখককে ছুঁতে পারেনি, তিনি তার সাহিত্যে তুলে এনেছেন মানুষের একেবারে ঘরের কথাকে, বন জঙ্গলের পশু পাখিদের কলরবকে। তুলে এনেছেন পাহাড়ি আদিবাসীদের ঘরের উনুন থেকে শুরু করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক পরিস্থিতি সর্বোপরি তিনি জঙ্গল এবং জঙ্গলে বসবাসকারী জনজাতিদের জীবন কথাকে যেভাবে গ্রন্থের মাঝে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অনস্বীকার্য।

Reference:

১. বৈরাগী, হারাধন, হৃদয়ে রাইমা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৫
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. তদেব, পৃ. ১৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ২৫
৭. তদেব, পৃ. ২৯
৮. তদেব, পৃ. ২৯
৯. তদেব, পৃ. ২৯
১০. তদেব, পৃ. ৩২

১১. তদেব, পৃ. ৩৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫
১৭. তদেব, পৃ. ৫৩
১৮. তদেব, পৃ. ৫৪
১৯. তদেব, পৃ. ৫৫
২০. তদেব, পৃ. ৫৬

Bibliography:

বৈরাগী হারাধন, হৃদয়ে রাইমা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, জানুয়ারি, ২০২১